ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ২০৩-২১৬
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4114

স্মৃতিকথায় মুক্তিযুদ্ধ '৭১: প্রসঙ্গ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোঃ মোরশেদুল আলম
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: The Liberation War of Bangladesh was a revolution and armed conflict sparked by the rise of the Bengali nationalist and self-determination movement in East Pakistan, which resulted in the independence of Bangladesh. The teachers, students, officials and staff of Chittagong University had played a significant role during the War of Liberation in 1971. On the eve of the war, the then Vice-Chancellor of the University Dr. Azizur Rahman Mallick, to organize resistance against the possible attack of the Pakistani army, on March 8, chaired the meeting where the 'Chittagong University Sangram Parishad' was formed. One teacher, eleven students and three staff members of the University embraced martyrdom in the War of Liberation. Mohammad Hossain, an employee of the Engineering Department of Chittagong University was honored with the gallantry award of 'Bir Protik' for his historic role in the War of Liberation. In this research article, an attempt has been made to highlight the various aspects of the Liberation War that took place in Chittagong University in 1971.

Key Words: Chittagong University, 1971 in Chittagong, Mohammad Hossain, Bir Pratik.

পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৩ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের পর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীক নিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। দলটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন শিক্ষক আনিসুজ্জামান বলেন,

> আমি নিজে ভোটার ছিলাম হাটহাজারী এলাকায়। সেখানে জাতীয় পরিষদ সদস্য পদে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী, দৈনিক আজাদী পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ এবং কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রার্থী ফজলুল কাদের চৌধুরী। আর প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পার্শ্ববর্তী মদনহাটের আবদুল ওয়াহাব এবং তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কনভেনশন মুসলিম লীগের আলী আহমদ।[১]

কিন্তু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ এক ঘোষণার মাধ্যমে ৩ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে গোপনে বাঙালি হত্যার নীল নকশা তৈরি করে। এ ঘোষণার সাথে সাথে ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব বাংলায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।[২] মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের একটি শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়। প্রতিরোধ যুদ্ধের শুরুতেও এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। আনিসুজ্জামান এ প্রসঙ্গে বলেন,

> ১ মার্চে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে আমরা শেষ পর্ব এম এ পরীক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছিলাম।...পরীক্ষার্থীরা আসছে-যাচ্ছে, এরই মধ্যে বাইরে স্লোগান এবং উত্তেজিত কয়েকজন নেতা-গোছের ছাত্রের প্রবেশ। তারা বললো, প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেছেন, এর প্রতিবাদে সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে; বঙ্গবন্ধু সহকর্মীদের নিয়ে সভা করছেন, খানিক পরে কর্মসূচি পাওয়া যাবে। আমরাও সামান্য পরামর্শের পর পরীক্ষা স্থগিত করে দিলাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, অফিসার্স এসোসিয়েশন ও কর্মচারী সমিতি প্রেসিডেন্টের ঘোষণার নিন্দা করে বিবৃতি দিলো।[৩]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম এ পরীক্ষার্থী শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার। তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন,

> ১লা মার্চ ছিল এম এ শেষ পর্বের মৌখিক পরীক্ষার দিন। পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে আসার পর শোনা গেল নানা অস্থির গুঞ্জন। একটা বাজার পরপরই সবার মধ্যে ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ল। দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে এক বেতার ভাষণে... জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেছেন।...আমাদের নির্ধারিত দিনে যতজনের পরীক্ষা নেওয়ার ছিল তাদের পরীক্ষা নিয়ে সবাইকে বাড়ি চলে যেতে বলা হলো।[৪]

ইয়াহিয়া খানের এ ঘোষণার পর পূর্ব বাংলার শাসন মূলত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরি বৈঠকে ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে সাড়া দেয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় এই হরতালের চিত্রায়ণে আনিসুজ্জামান লিখেছেন,

> ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রতিবাদে ১ মার্চ থেকেই একরকম ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। স্থানীয় নেতারা ২ তারিখে চট্টগ্রামেও ধর্মঘট আহ্বান করেন এবং তা খুব সফল হয়। তবে ৩ তারিখে, প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটের দিনে, চট্টগ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের পতাকা পোড়ানোর পরে এবং ৪ তারিখে বাঙালি-বিহারি সংঘর্ষ হয়।...প্রথম আক্রমণটা করে বিহারিরাই।...বেসামরিক প্রশাসনের আহ্বান ব্যতিরেকেই সামরিক বাহিনীর একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে বেপরোয়া গুলি চালায় এবং বাঙালিরা প্রধানত শিকার হয় তারই।...আহতদের রাখার মতো জায়গা হাসপাতালে ছিল না। খবর পেয়ে আমরা ব্লাড ব্যাংকে রক্তদানের সিদ্ধান্ত নিই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী

> মেডিক্যাল অফিসার ডা. কে এম আক্তারুজ্জামানের সক্রিয়তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আমাদের ব্যক্তিগত গাড়িতে বহুসংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে রক্তদান করতে যাই।[৫]

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ঐতিহাসিক এ ভাষণে বাঙালি জাতিকে মুক্তির আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।...রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।'[৬] *The Daily Telegraph* পত্রিকার প্রতিনিধি ডেভিড লোসাক 'The end of the old Pakistan' প্রতিবেদনে মন্তব্য করেন, 'On Sunday [March 7] Sheikh Mujib came as near to declaring this [Independence] as he could without inviting immediate harsh reaction from the Army.'[৭]

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার রেকর্ড ৮ মার্চ বেতারে প্রচারিত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক এই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হন। আনিসুজ্জামানের ভাষায়: বেলা ১১ টার দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সভা হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কোনো মিলনায়তন ছিল না বলে বাণিজ্য বিভাগের একটি ক্লাসরুমে। ভাইস-চ্যান্সেলর ড. এ আর মল্লিক সভাপতিত্ব করলেন। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকে যোগ দিলেন। সভায় গঠিত হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ। এর যুগ্ম আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন গণিত বিভাগের ফজলী হোসেন ও বাংলা বিভাগের মাহবুব তালুকদার। ছাত্রদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করিনি। ছাত্র-সংগঠনগুলো বেশির ভাগই মিলিতভাবে কাজ করছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং যোগাযোগ রক্ষা করছিল চট্টগ্রাম শহরভিত্তিক চট্টগ্রাম জেলা সংগ্রাম পরিষদ এবং স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে।[৮]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, আনিসুজ্জামান (বাংলা), অধ্যাপক আবদুল করিম ও রফিউদ্দীন আহমদ (ইতিহাস), অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরী (রাজনীতি বিজ্ঞান), ড. এখলাসউদ্দীন আহমদ (পদার্থবিজ্ঞান), ড. এম বদরুদ্দোজা (সমাজবিজ্ঞান), রশিদ চৌধুরী (চারুকলা), হুজ্জাতুল ইসলাম লতিফী (অর্থনীতি)। কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন মুহম্মদ খলিলুর রহমান (রেজিস্ট্রার), আবু হেনা মোহাম্মদ মহসীন (ডেপুটি রেজিস্ট্রার), সুধীর রঞ্জন সেন (সহকারী ইঞ্জিনিয়ার) প্রমুখ। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ হাটহাজারী এলাকার দায়িত্বে ছিলেন এম. এ. ওহাব এম পি এ।[৯] এই পরিষদের সদস্যরা বিভিন্নভাবে জনগণকে সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করেন।[১০] এই পরিষদের সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁরা অনেকেই বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ৭ মার্চের পর চট্টগ্রাম জেলা ও শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এলাকাভিত্তিক সামরিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। সেখানে সামরিক প্রশিক্ষক হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডেট

কোরের প্রধান ক্যাডেট শামসুজ্জামান হীরাও দায়িত্ব পালন করেন।[১১] এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডামি রাইফেল দিয়ে বিভিন্ন পজিশনে তা ব্যবহার ও গুলি করার নিয়ম শেখানো হতো। এছাড়াও ক্রলিং, রোলিং, ক্যামোফ্লেজসহ গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া হয়।[১২] ৮ মার্চ বিকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল ফজলের শহরের বাসভবন 'সাহিত্য নিকেতন'-এ স্থানীয় সংস্কৃতিসেবীদের এক স্বতঃস্ফূর্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন আবুল ফজল। এছাড়াও উপাচার্য অধ্যাপক এ. আর. মল্লিক, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, মাহমুদ শাহ কোরেশী, শিল্পী রশিদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রবসহ বহু ছাত্র ও তরুণ সংস্কৃতিকর্মী এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ সভায় 'শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘ' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। সভা শেষ হওয়ার পর সংঘের প্রথম কর্মসূচি হিসেবে তাঁরা একটি মিছিলসহ সাহিত্য নিকেতন থেকে নিউমার্কেট পর্যন্ত যান। ৯ মার্চ থেকে চট্টেশ্বরী রোডস্থ চট্টগ্রাম শিল্প ও সাহিত্য পরিষদ কার্যালয়ে সংঘের উদ্যোগে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, পথসভা, গণসংগীত, নাটক, গান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গণজাগরণ সৃষ্টি করে। ১০ মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ ইবরাহিম ও সাধারণ সম্পাদক আবদুর রব এক বিবৃতির মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তা ও সদস্যদের কোনো অবস্থায় অস্ত্র সমর্পণ না করতে আহ্বান জানান। তখনকার পরিস্থিতিতে এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৫ মার্চ প্রতিরোধ সংঘের উদ্যোগে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক এবং সংস্কৃতিকর্মীদের নিয়ে চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে সমাবেশ হয়। বক্তৃতার পর্ব শেষ হলে সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। এরপর মঞ্চস্থ হয় মমতাজউদ্দীনের রচিত ও পরিচালিত নাটক *এবারের সংগ্রাম*। এসব গণসংগীত ও নাটক ২৩ মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন জংশন, মোড় ও স্টেশনে পরিবেশিত হয়। এ প্রসঙ্গে অনুপম সেন বলেন,

> চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই প্রত্যয়কে সাধারণ জনগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াসে, ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে লালদিঘির ময়দানে সপ্তাহব্যাপী এক কর্মসূচি পালন করে। প্রায় প্রতিদিন সভা আরম্ভ হওয়ার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম শহরের মুখ্য সড়কগুলোতে ট্রাক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হতো-যেখানে অসহযোগের বাণী, স্বাধীনতার বাণী সম্বলিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শিত ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হতো।[১৩]

লালদিঘির সভাতে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। মুখ্যত লালদিঘির সভাটি ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি পরিচালিত, তা সত্ত্বেও এখানকার কর্মকাণ্ডে চট্টগ্রামের তৎকালীন

বিশিষ্টজনেরা ও সংস্কৃতিকর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ প্রসঙ্গে এ. আর. মল্লিক তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন,

> বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই 'কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্স' নামে এক কেন্দ্র ছিলো। সেখানে ড. আবদুল হাই নামে এক ব্যক্তি তাঁর সহযোগিদের নিয়ে সংগ্রামে যোগ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে আমরা জানতে পারি। তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আমাদের ল্যাবরেটরীতে হাতবোমা, গ্রেনেড ইত্যাদি তৈরি করা যায় কিনা সে ব্যাপারে খবর নিতে এবং সম্ভব হলে অবিলম্বে এসব প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে আমি অধ্যাপক শামসুল হককে এক গোপনীয় মৌখিক নির্দেশ দিই।...ভবিষ্যতে আমাদের কাজে লাগতে পারে ভেবে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার জনাব ইউ এন সিদ্দিকীর মারফতে আমাদের দু'জনের বন্দুকের লাইসেন্সকে ভিত্তি করে বেশ উচ্চ ধ্বংসক্ষমতাসম্পন্ন কার্তুজ বাজার থেকে কিনে রাখি।[১৪]

১৭ মার্চ ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর তরুণ বাঙালি অফিসারদের পূর্বাপর ঘটনা এবং প্রস্তাবিত কর্মপন্থা অবহিত করার জন্য তাঁর সারসন রোডস্থ বাসায় আমন্ত্রণ জানান। এরপর সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন হারুন আহমদ চৌধুরী, ডা. জাফর, আতাউর রহমান খান কায়সার, ক্যাপ্টেন রফিক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান আলমের বাসায় মিলিত হন। সেখানে তাঁরা যুদ্ধের সম্ভাব্য প্রস্তুতি বিষয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা কথা বলেন।[১৫] ২৩ মার্চ উপাচার্যের সভাপতিত্বে প্যারেড গ্রাউণ্ডে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> ২৩ মার্চ সকালে আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই কে বা কারা চট্টগ্রাম বেতার থেকে বারবার ঘোষণা করেন যে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনে ঐ দিন চট্টগ্রাম শহরে সর্বস্তরের ছাত্র-শিক্ষক-জনতার এক বিরাট মিছিল হবে আমার নেতৃত্বে। মিছিল শেষে আমার সভাপতিত্বে প্যারেড গ্রাউন্ডে এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।...নির্ধারিত মিছিলে যোগ দিলাম এবং মিছিল শেষে এক বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করি। এ সভায় বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে আমার সঙ্গে অনেকেই একাত্ম ঘোষণা করেন। এদিন ঐ সভাতেই আমি ঘোষণা করলাম 'আজ থেকে আমি আর উপাচার্য নই। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত একজন মুক্তিসংগ্রামী হিসাবে আমি নিজেকে মনে করবো।' জনতার ইচ্ছায় ঐ সভাতেই স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করি।[১৬]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সভাপতি ওয়াহেদ আজগর চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আখতার আলীর নামে প্রচারিত একটি লিফলেটে এ তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন ইউ ও টি সি'র (বর্তমান বিএনসিসি) ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এ আতহার। এ. আর. মল্লিক তাঁকে বলেন, 'প্রশিক্ষণের জন্য ছাত্র বাছাই করে দিতে এবং ইউ ও টি সি-এর ডামি রাইফেলগুলো সক্রিয় করার চেষ্টা করতে। কিছু ছাত্র বাছাই করা হয় বটে, কিন্তু ডামি রাইফেল সক্রিয় করা সম্ভবপর হয়নি। অল্প কয়েকটি রাইফেল ও গ্রেনেড জোগাড় করে নিতান্ত অল্পকালের জন্যে এসব ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দেওয়া

হয়েছিল ক্যাম্পাস-সন্নিহিত পাহাড়গুলোর মধ্যভূমিতে।'[১৭] এ. আর. মল্লিক স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি সম্পর্কে বলেন,

> ২৪শে মার্চ সকালে শহরে যারা আমাদের মতো জনসংগ্রামে যোগ দিয়েছেন-তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে টেলিফোনে আমরা যোগাযোগ করি।... শহরে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে শত্রুসৈন্য পথে বের হলে যাতে স্থানীয় লোকজনের সাহায্যে তাদের বাধা দেওয়া হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে আমরা বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নিই। এর মধ্যে রাউজান এবং হাটহাজারী থানার সঙ্গে আমি টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপন করি এবং স্থানীয় নেতাদের সহায়তায় প্রতিরোধ গড়ার জন্য আমি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নিই।...শহরের বাইরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রামের এক শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হলো।[১৮]

২৫ মার্চ সোয়াত জাহাজ থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা অস্ত্র খালাসের চেষ্টা চালায়। তাদের বাধা দেয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষ বন্দর-এলাকা ঘিরে রাখে এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে।[১৯] এ কাজে সহযোগিতার জন্য ড. এ. আর. মল্লিক অবিলম্বে জনতাকে শহরের বড় বড় রাস্তায় বিশেষ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হওয়ার রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করতে পরামর্শ দেন। ঐ দিন সামরিক বাহিনীর গুলিতে চট্টগ্রামে ২৩ জন মারা যায়।[২০] এ. আর. মল্লিক ঢাকার উত্তাল পরিস্থিতির বিবরণে লিখেন, 'রাতে ঢাকার বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে টেলিফোনে খবর পাই যে, সেনাবাহিনীর ট্যাংক ঢাকার বিভিন্ন বড় বড় রাস্তায় বিশেষ করে সংযোগ স্থলে পজিশন নিয়েছে। শেখ সাহেবকেও নাকি গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সান্ধ্য আইন জারি হতে যাচ্ছে।' রাত এগারোটার দিকে তিনি শিক্ষকদের ফোন করে তাঁর অফিসে যেতে বলেন। সেখানে উপস্থিত হন রেজিস্ট্রার মুহম্মদ খলিলুর রহমান এবং শিক্ষকদের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল করিম, মোহাম্মদ শামসুল হক, রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী, ফজলী হোসেন ও মাহবুব তালুকদার। আনিসুজ্জামানের লেখায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা ফুটে উঠে:

> চট্টগ্রাম এবং ঢাকায় যেসব টেলিফোন নম্বরে আমরা যোগাযোগ করতে চেয়েছিলাম, তার বেশিরভাগই ব্যস্ত ছিল। নেতৃস্থানীয় অনেককেই বাসায় পাওয়া গেলো না। আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, সবাই খোঁজ-খবর নিচ্ছেন এবং ভয়ানক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। রাত বারোটায় বা তার পরপরই ঢাকার সঙ্গে আমাদের টেলিফোন-যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেলো। আমাদের আশঙ্কা যে সত্যে পরিণত হতে যাচ্ছে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ রইলো না।[২১]

এ. আর. মল্লিক নিজে সংগঠিত করেছেন পুলিশ, ইপিআর, ছাত্র-জনতাকে। এক জায়গায় সমবেত করে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা দিয়ে তাদের চট্টগ্রাম রণাঙ্গনে পাঠিয়েছেন।[২২] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক প্রতিরোধ কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুবেদার আবদুল গণি। ইপিআরদের নিয়ে সেনানিবাসের উত্তর দিক ঘিরে রাখার সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয়। এজন্য ক্যাম্পাসের ঠিকাদারদের শ্রমিক দিয়ে রাতেই পরিখা খনন করা হয়। আনিসুজ্জামান লিখেন,

> রাঙামাটির ডি সি এইচ টি ইমাম টেলিফোনে ভাইস-চ্যান্সেলরকে খবর দিয়েছেন যে, সীমান্ত-অঞ্চল থেকে ই পি আরের বাঙালি সদস্যদের পাঠানো হচ্ছে চট্টগ্রাম সেনানিবাস ঘিরে রাখার জন্যে। বিশ্ববিদ্যালয়-ক্যাম্পাসেই তাঁদের বেজ ক্যাম্প করে দিতে হবে। অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা এবং সংবাদ-সংগ্রহের সমুদয় ব্যবস্থা করতে হবে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল দুটিমাত্র হল এবং আলাওল হলের প্রভোস্ট ছিলেন রফিকুল ইসলাম চৌধুরী আর আমি এ এফ রহমান হলের। তাৎক্ষণিক দায়িত্ব তাই আমাদের দুজনের ওপর পড়লো। আমি হলে গিয়ে হাউজ টিউটর এবং কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আবার ভাইস-চ্যান্সেলর অফিসে ফিরে এলাম।[২৩]

২৮ মার্চ পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট থেকে চার শতাধিক বাঙালি সৈনিক আত্মরক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে অবস্থান নেয়। চট্টগ্রামের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হাটহাজারীতে অবস্থিত হওয়ার কারণে স্বভাবতই সেখানকার ছাত্র সমাজের প্রভাবে স্থানীয় জনগণও দুর্বার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।[২৪] ইপিআরের আসার সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশের গ্রামবাসী সে রাত থেকেই চাল-ডাল, তরি-তরকারি, হাঁস-মুরগি, ফল-মূল নিয়ে আসতে থাকেন। প্রত্যেকেই তাদের সাধ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করেন। অবস্থা এমন হয় যে বিশ্ববিদ্যালয় হলের দুটি কামরা চাল-ডাল ও আটার বস্তায় ভরে যায়। খাবার-দাবার ঠিকমত যত্নে রাখা এবং চাল, ডাল, হাঁস, মুরগী যাতে নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থানরত চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের এ দায়িত্ব দেয়া হয়। রাতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আবদুল ওয়াহাব এসে শিক্ষক এবং সৈন্যদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা-বার্তা বলেন।[২৫] সে রাত থেকেই সেনানিবাসের দুপাশ ঘিরে ইপিআর মোতায়েন করা হয়। উপাচার্যের অফিস এক ধরনের সমর-দপ্তরে পরিণত হয়। উপাচার্য এ. আর. মল্লিক স্বভাবত অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। আনিসুজ্জামানকে তাঁর সার্বিক সহকারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। উপাচার্যের সাংকেতিক নামকরণ হয় ড্যানিয়েল। সবদিক বিবেচনা করে প্রথমে ক্যান্টনমেন্টের উত্তরে ট্রেঞ্চ করে জওয়ানদের পোস্ট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সন্ধ্যায় তাঁদের বদলে আর এক গ্রুপকে পাঠানো হতো। ক্যান্টনমেন্টের পূর্ব দিকে আরও কয়েকটি ট্রেঞ্চ কেটে বীর মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইল খানেক দূরে পূর্ব দিকে গ্রামে ওয়্যারলেস যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। গাড়ি ও পেট্রোল দেয়ার অনুরোধ জানানো হলে অনেকে গাড়ি দিয়ে সহযোগিতা করে। আবার কেউ কেউ ট্রাক ও জীপ দিয়ে যায়। এগুলো চালানোর জন্য ড্রাইভারের ব্যবস্থা হয়ে যায়। আবদুল কুদ্দুছ টুনু কোম্পানির ৯৭১৮ ও ৩১৯৪ নং ট্রাক, ২৯৬ নং বাস, ৮০৮৪ নং জীপে করে ইপিআর মুক্তিফৌজদের যুদ্ধের জন্য হাটহাজারীর মদনহাট ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হতো।[২৬] শিক্ষক ও অফিসারদের মধ্যে নানারকম দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়। হাটহাজারীর দুটি

পেট্রোল পাম্পের মালিককে বলা হয় যে, তাঁরা যেন কেবল আবদুল করিমের স্বাক্ষর করা চিরকুট অনুযায়ী গাড়িতে পেট্রোল দেন এবং নগদ দেয়া সম্ভব না হলে যেন বাকিতে দেন।[২৭] ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক এবং ইউ ও টি সি'র লেফটেন্যান্ট মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক ছাত্রদের নিয়ে একটা সশস্ত্র দল গঠন করে প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করেন। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয় শারীরিক প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক জহুরুল হোসেনকে। ক্যাম্পাসে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। পাকিস্তানি সৈন্যদের ভারী অস্ত্র-শস্ত্র ও অভিযানের মুখে ২৮ মার্চ থেকে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত সেনারা পশ্চাদপসারণ করতে শুরু করে। কোনো কোনো সংযোগক্ষেত্রের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। একদিন ক্যাম্পাসের ভেতরে একজন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তার লাশ কেউ ফেলে রেখে যায়। সে রাতেই তাঁকে ক্যাম্পাসে কবর দেয়া হয়। পাকিস্তানি সেনারা চট্টগ্রাম দখল করার পর তার দেহাবশেষের খোঁজে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল।[২৮]

মার্চের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শামসুল আলমের বাসায়। তিনি এক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিফ মেডিকেল অফিসার আবুল বাশারও এসময় সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি শরণার্থী হিসেবে আগরতলায় ছিলেন। মার্চের দিনগুলোতে কর্মচারীগণ উপাচার্যের নির্দেশে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ও ব্যাংকগুলোর সুরক্ষা দিয়েছিলেন। প্রায় পাঁচশত ইপিআর জাওয়ান ও কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহে কর্মচারীরা বিশেষ ভূমিকা রাখেন।[২৯]

এ. আর. মল্লিক অত্যন্ত সচেতনতার সাথে তাঁর নতুন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। একদিন বেলুচ রেজিমেন্টের এক বাঙালি মেজর পালিয়ে ক্যাম্পাসে আসেন। তাঁর চালচলন ও কথাবার্তা একটু সন্দেহজনক মনে হওয়ায় অধ্যাপক মল্লিক ই পি আর-এর জনচারেক জওয়ানকে নিয়ে এসে তাঁকে নিরস্ত্র ও গ্রেপ্তার করতে বলেন। পরে সন্দেহ দূর হলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২৯ মার্চ ই পি আরের জওয়ানদের মধ্যে কেউ ক্যাম্পাস সীমানা থেকে একটি পাকিস্তানি হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এর প্রতিক্রিয়ায় ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিছু সৈন্য এসে আবদুল হাই ও তাঁর সহকর্মীদের বাড়ি তল্লাশি করে এবং তাঁদের টেলিফোন সংযোগ কেটে দেয়। আনিসুজ্জামান ২৯ মার্চ পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন,

> ২৯ তারিখে পাকিস্তানিরা আরো সাফল্য লাভ করে, চট্টগ্রামের অনেকখানি তাদের দখলে চলে আসে। তখনই ক্যাম্পাসবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যায়। ক্যাম্পাসে ছাত্র প্রায় ছিলই না, দু-চারজন যাও ছিল, তারা এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছিল। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেশিরভাগই ছিলেন পরিবার নিয়ে।...অগ্রসরমান পাকিস্তানিদের রুখতে রাউজান ও নাজিরহাটের রাস্তায় প্রতিবন্ধক পড়বে বলেও নিশ্চিত জানা গেলো স্থানীয় রাজনৈতিক সূত্রে। ই পি আরের কয়েকজন আহত সৈন্য ছাড়া বাকিরাও যেন

> কোথায় চলে গেলেন আমাদের না বলে। সুতরাং ক্যাম্পাসে আর কেউই নিরাপদ বোধ করছিলেন না।[৩০]

২৯ তারিখ থেকে ক্যাম্পাসের সাথে শহরের রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক কর্তাদের যোগাযোগও ছিন্ন হয়ে যায়। ঐদিন চট্টগ্রাম শহরের পতন হয়। মনিরুজ্জামান বলেন, '...বাসার সামনে যে ব্যাংকটা ছিল, সেখানে একটা মর্টারের শেল এসে পড়লো। বোঝা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সৈন্য সমাবেশের খবর শত্রুশিবিরে পৌঁছে গেছে। তখন আমাদের আর ক্যান্টনমেন্টের মধ্যেকার গোপন যুদ্ধের ১৭ দিন। আমরা আর কিছু ভারী অস্ত্রের অপেক্ষায় ছিলাম ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করার বা ক্যান্টনমেন্টের মুখোমুখি হওয়ার। কিন্তু মল্লিক সাহেব কোথা থেকে কুণ্ডেশ্বরী বালিকা স্কুলের একটা বাস পাঠিয়ে খবর দিলেন এই মুহূর্তে আমরা যেন এই বাসে করে ক্যাম্পাস ত্যাগ করি। নইলে আমরা শত্রুর আক্রমণের মুখে পড়ে যাব।'[৩১] এ. আর. মল্লিক এ প্রসঙ্গে লিখেন,

> আমরাও স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলাম। ক্যাম্পাসের যে কয়জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ছিল তাঁদের দায়িত্ব দিয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার বাশার ও ডাক্তার আক্তারউজ্জামানের উপর। আমরা নাজিরহাটের দিকে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। সৈনিকরা নাজিরহাটে ক্যাম্প করে থাকবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবার আগ পর্যন্ত, ইউওটিসি'র ছেলেদের বলল যে ক্যাম্পাস ছেড়ে যেতে এবং যে যেখানে পারে যে কোনো সংস্থার সাথে যুক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করতে। আমার পক্ষে পরবর্তীতে তাদের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয় এবং আমাদের পক্ষে যে ক্যান্টনমেন্ট আর অবরোধ করে রাখা সম্ভব নয় তাও তাদের বুঝিয়ে বললাম। ক্যাম্পাসে যেসব শিক্ষক পরিবার ছিল তাদের পাঠিয়ে দিলাম কুণ্ডেশ্বরী গার্লস হাই স্কুলে। ওখানে সব পরিবার জমা হলেন। নূতন সিংহ সবার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।[৩২]

পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩০ মার্চ ক্যাম্পাস থেকে কয়েকটি বাসে করে শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের একাংশকে নাজিরহাটে পাঠানো হয়। অন্যরা গিয়ে কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে আশ্রয় নেন।[৩৩] আনিসুজ্জামান এ প্রসঙ্গে বলেন,

> ড. মল্লিক প্রথমে বললেন, শুধু মেয়ে ও শিশুদের সরিয়ে দেওয়া হবে। আমরা অন্যেরা বললাম, পুরুষদের কেউ স্বেচ্ছায় থাকলে থাকবেন, ওরকম নিয়ম করে দেওয়া ঠিক হবে না। শেষে স্থির হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করে রাউজান ও নাজিরহাট-এই দুই পথে সবাইকে সরিয়ে নেওয়া হবে। যাঁদের নিজেদের আশ্রয় আছে, তাঁরা সেখানে চলে যাবেন। যাঁদের নেই, তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হলো কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের হোস্টেলে।[৩৪]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অনেকটা বাধ্য হয়েই রাউজান থানা এলাকার কুণ্ডেশ্বরীতে আশ্রয় নেয়। তাঁদের আশ্রয় দিতে পেরে কুণ্ডেশ্বরীর মালিক নূতন চন্দ্র সিংহ খুশি হন।[৩৫] শহিদ নূতন চন্দ্র সিংহের ছোট ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফুল্ল রঞ্জন সিংহের স্ত্রী কল্যাণী সিংহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। তাই নূতন চন্দ্র সিংহের সাথে চট্টগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্প স্থাপনের খবর পেয়ে তা দখল করে নেয় এবং আলাওল হলের সংসদ কক্ষে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানায়। তাই মুক্তিযুদ্ধকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে হাটহাজারীর স্থানীয় নেতৃবৃন্দের একটা সমন্বয় ছিল।[৩৬] এম. এ. ওহাব বলেন,

> পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ অংশের পতনের পর সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য অবস্থান নিই। সাথে কয়েকজন বিডিআরসহ ছাত্র ও যুব ব্রিগেডের অনেক সদস্য ছিলেন। অগ্রসরমান পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বেশ কয়েক দফা আমাদের সংঘর্ষ হয়। থ্রি নট থ্রি রাইফেলসহ ক্ষুদে অস্ত্র নিয়ে আমরা মহান দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তানিদের ট্যাংক ও সাঁজোয়া বহরের আক্রমণ প্রতিহত করি। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটির পতনের পর আমরা নাজিরহাট হয়ে রামগড় চলে যায়।[৩৭]

প্রতিষ্ঠার ছয় বছরের মধ্যেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ আর মল্লিক, বাংলা বিভাগের শিক্ষক আনিসুজ্জামান প্রমুখের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ও ভারতের বাইরে জনমত গঠন, শরণার্থীদের জন্য মানবিক সাহায্য সংগ্রহ, আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে তাঁদের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বহু সংখ্যক ছাত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। আবার অনেককেই শরণার্থী জীবনকে বেছে নিতে হয়।[৩৮] মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন ছাত্র, ১ জন শিক্ষক এবং ৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে শহিদ হন।[৩৯] নিম্নে তাঁদের নাম তুলে ধরা হলো:

(১) শহিদ মোহাম্মদ হোসেন (বীর প্রতীক), চেইনম্যান, প্রকৌশল দপ্তর; (২) শহিদ অবনী মোহন দত্ত, খণ্ডকালীন শিক্ষক, দর্শন বিভাগ; (৩) শহিদ আবদুর রব, ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ ও চাকসু'র জি. এস.; (৪) শহিদ ফরহাদ-উদ-দৌলা, ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ; (৫) শহিদ আবুল মনসুর, ছাত্র, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ; (৬) শহিদ মোহাম্মদ হোসেন, ছাত্র, বাংলা বিভাগ; (৭) শহিদ মোস্তফা কামাল, ছাত্র, বাংলা বিভাগ; (৮) শহিদ খন্দকার এহসানুল হক আনসারি, ছাত্র, বাণিজ্য বিভাগ; (৯) শহিদ মনিরুল ইসলাম খোকা, ছাত্র, বাংলা বিভাগ; (১০) শহিদ আবদুল মান্নান, ছাত্র, অর্থনীতি বিভাগ; (১১) শহিদ নাজিম উদ্দিন খান, ছাত্র, অর্থনীতি বিভাগ; (১২) শহিদ আশুতোষ চক্রবর্তী, ছাত্র, ইংরেজি বিভাগ; (১৩) শহিদ ইফতেখার উদ্দিন মাহমুদ, ছাত্র, সমাজতত্ত্ব বিভাগ; (১৪) শহিদ প্রভাষ কুমার বড়ুয়া, সাব-অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, (১৫) শহিদ ছৈয়দ আহমদ, প্রহরী, প্রকৌশল দপ্তর।

শহিদ মোহাম্মদ হোসেন মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মরণোত্তর 'বীর প্রতীক' উপাধিতে ভূষিত হন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল দপ্তরের চেইনম্যান ছিলেন তিনি। এ অকুতোভয় সৈনিক নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জাহাজ ধ্বংসের জন্য জাহাজ বিধ্বংসী লিম্পেট মাইন নিয়ে খরস্রোতা কর্ণফুলী নদীর উত্তাল তরঙ্গে মিশে গিয়ে শত্রু ঘাঁটিতে হানা দিয়ে সফলতার সাথে অপারেশন সমাপ্ত করেন। ১৪ সেপ্টেম্বর বহির্নোঙর এলাকায় তাঁর লাশ পাওয়া যায়। তখনও তাঁর শরীরে লিম্পেট মাইনটি বাধা ছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের জি এস আবদুর রব প্রশিক্ষণার্থী মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলকে রামগড়ে পৌঁছে দেয়ার পথে পাকিস্তানি বাহিনীর অ্যামবুশে পড়ে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনে শহিদ হন। শহিদ আবুল মনসুর ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন গ্রুপের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর আল বদর বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। তাদের পৈশাচিক নির্যাতনের কারণে তিনি শহিদ হন। শহিদ অবনীমোহন দত্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন। তিনি নিজ গৃহ থেকে বাঙালি সৈন্যদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে ডেকে নিয়ে যায়। তিনি সেখান থেকে আর ফিরে আসেননি। শহিদ খন্দকার এহসানুল হক আনসারী তাঁর বোন মুশতারী শফীর বাসায় থেকে পড়াশোনা করতেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীরা মুশতারী শফীর বাসায় একত্রিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন। এহসানুল হক আনসারী বিবিসি, আকাশবাণী, ভয়েস অব আমেরিকাসহ বিদেশি বেতার কেন্দ্রের সংবাদ শুনে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে বুলেটিন তৈরি করে রাতের অন্ধকারে তা কালুরঘাটস্থ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিয়ে যেতেন। ২৭ মার্চ মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করার লক্ষ্যে ট্রাকভর্তি গোলা-বারুদ মুশতারী লজে রাখা হয়।[৪০] ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী মুশতারী লজ ঘেরাও করে ডা. শফি, বেগম মুশতারী শফী ও খন্দকার এহসানুল হক আনসারীকে তুলে নিয়ে যায়। বেগম মুশতারী শফীকে ছেড়ে দিলেও ডা. শফি ও এহসানুল হক আনসারীকে নিয়ে যায়। তাঁরা আর ফিরে আসেননি।[৪১] শহিদ ফরহাদ-উদ-দৌলা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পাকিস্তানি বাহিনীর দখলে চলে যাওয়ার পর তিনি কক্সবাজারে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার দায়িত্ব নেন। তখন এলাকাটি পাকিস্তানপন্থি দালালদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। একপর্যায়ে ফরহাদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি দালালদের হাতে ধরা পড়ে। দালালরা তাঁদের পাকিস্তানি বাহিনীর নিকট তুলে দেয়। পাকিস্তানি হায়েনারা খুরুসকূল খালের চরে তাঁদের দাঁড় করিয়ে গুলি চালায়। ফরহাদ গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁকে মৃত ভেবে অন্যদের সাথে খালের চরে বালি চাপা দেয়। পরে পাকিস্তানি সেনারা চলে গেলে ফরহাদ উঠে এসে মসজিদে আশ্রয়

নেয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা এ খবর পেয়ে তাঁকে মসজিদ থেকে বের করে বাকখালী খালের নিকট নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। পরে তাঁর মৃতদেহ খালে ভাসিয়ে দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বহু সংখ্যক ছাত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ও অনেককেই শরণার্থী জীবনকে বেছে নিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও বার্মায় শরণার্থী হিসেবে আবার কেউ যুব শিবিরে ছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি অংশ ছিল কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এদের অবদান ছিল সহযোগী হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের ওই নয় মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা ও যথার্থতা ভারতীয় জনগণ এবং বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরতে, ব্যাখ্যা করতে তাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন। এভাবে তাঁরা মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশকে শত্রুমুক্ত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলার পর অবশেষে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর এক সম্মিলিত কমাণ্ডের নিকট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ৯০ হাজার সৈন্যের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭), ১৫।

২. মো. আনোয়ার হোসেন, 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতীয় পুনর্জাগরণ', শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৮), ১১৫।

৩. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ২১।

৪. শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার, *চার হাত কাঁটাতার* (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৫), ১১৩।

৫. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ২২।

৬. মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩), ৬১৬।

৭. *The Daily Telegraph*, 10 March 1971; https://songramernotebook.com/archives/466428 [Accessed On: 19 June 2023.]

৮. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ২৫।

৯. সুপ্রিয় রক্ষিত, 'প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথম পর্ব', *হাজার বছরের চট্টগ্রাম*, *দৈনিক আজাদী*'র ৩৫ বছরপূর্তি বিশেষ সংখ্যা, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫, ৪৭।

১০. মাহফুজুর রহমান, *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম: মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম* (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৩), ৪১০।

১১. শামসুজ্জামান হীরা, "সময়ের পলি-জমা স্মৃতির মিছিল", সুভাষ দে ও অন্যান্য (সম্পা.), *গেরিলা*, (চট্টগ্রাম, ২০০৮), ১৯।

১২. মাহবুবুল হক, "মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম: প্রগতিশীল তিনটি সংগঠনের ভূমিকা", মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ও আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *চট্টগ্রাম : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রথম খণ্ড (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি ও ইতিহাস বিভাগ, ২০১৫), ১৮৪।

১৩. অনুপম সেন, "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ও মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা", মুহাম্মদ শামসুল হক (সম্পা.), *ইতিহাসের খসড়া*, বর্ষ: ৩, সংখ্যা: ১ (চট্টগ্রাম: হাইওয়ে সোসাইটি, ২০১৬), ৭।

১৪. এ. আর. মল্লিক, *আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫), ৬২।

১৫. অনুপম সেন, "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, ৭।

১৬. এ. আর. মল্লিক, *আমার জীবন কথা*, ৬৩।

১৭. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ২৯।

১৮. এ. আর. মল্লিক, *আমার জীবন কথা*, ৬৪।

১৯. সাথী দাশ, "চট্টগ্রাম মহানগরী", আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪), ৫৫।

২০. চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত, "সোয়াত জাহাজ অবরোধ", *মুক্তিযুদ্ধ ও চট্টগ্রাম বন্দর* (চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, ২০০৮), ২১।

২১. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ৩৪।

২২. এইচ. টি. ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১২), ৩।

২৩. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ৩৬।

২৪. সাক্ষাৎকার: নাম: মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন, বয়স: ৬৫, পিতা: মরহুম মাওলানা আজিজুল হক, মাতা: আমেনা বেগম, পেশা: অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড। শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম. এ, ঠিকানা: গ্রাম: ফরহাদাবাদ, উপজেলা: হাটহাজারী, জেলা: চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: নিজ বাসভবন, তারিখ: ০৮.১২.২০২১ খ্রি.। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং যুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার।

২৫. সাক্ষাৎকার: নাম: মো. নূরুল আলম, বয়স: ৬৮, পিতা: মরহুম আবদুল হাকিম, মাতা: মরহুমা আনজমা খাতুন, পেশা: ব্যবসা, ঠিকানা: ধলই, গ্রাম: কাটিরহাট, উপজেলা: হাটহাজারী, জেলা: চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: নিজ বাসভবন, তারিখ: ১৭.০২.২০২২ খ্রি.। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং যুদ্ধ পরবর্তী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার (২০১০-১৩ খ্রি.)।

২৬. আবুল হাশেম, *হাটহাজারীর ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (চট্টগ্রাম: হাটহাজারীর ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশ প্রকল্প, ২০১৩), ৫৭২।

২৭. আবদুল করিম, *সমাজ ও জীবন*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), ৯৯।

২৮. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *মুক্তিযুদ্ধ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়* (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০২১), ৪৫।

২৯. *প্রাগুক্ত*, ৮২।

৩০. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ৩৯।

৩১. মনিরুজ্জামান, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মুক্তিযুদ্ধ ও স্মৃতিবাসন', মাছুম আহমেদ (সম্পা.), *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ সমাবর্তন স্যুভেনির* (চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬), ৩০।

৩২. এ. আর. মল্লিক, *আমার জীবন কথা*, ৭৩।

৩৩. উদ্ধৃত: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৯), ৪-৫।

৩৪. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ৩৯।

৩৫. মনিরুজ্জামান, "মুক্তিযুদ্ধে প্রবাদ নূতন চন্দ্র সিংহ", মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ (সম্পা.), *স্মৃতিদীপ*, *শহীদ নূতন চন্দ্র সিংহের একশত ষোলতম জন্মবার্ষিকীর প্রকাশনা* (চট্টগ্রাম: কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয় প্রেস, ২০১৬)।

৩৬. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, ষষ্ঠ খণ্ড, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১৩), ৪২১।

৩৭. এম. এ. ওহাব, "আমার দেশ- আমার মুক্তিযুদ্ধ", নাসিরুদ্দিন চৌধুরী (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (চট্টগ্রাম জেলা ইউনিট কমাণ্ড: প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী, ২০১৩), ৯৫২।

৩৮. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *মুক্তিযুদ্ধ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*, ৮২।

৩৯. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, *খন্ড ৪ (২য় সংস্করণ, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি*, ২০২৪), ২২২।

৪০. শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭), ৩০৭।

৪১. মুশতারী শফী, *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন* (ঢাকা: মূর্ধন্য, ২০১১), ৩৯-৪০।